দর্শন ও প্রযুক্তিবিদ্যা

নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী

সারসংক্ষেপ: বর্তমান প্রবন্ধে প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে কী কী দার্শনিক প্রশ্ন উঠতে পারে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। দর্শনের স্বরূপ নিয়ে কিছু মতের বিশ্লেষণ করে সেই মতগুলির সাথে 'Techne'-র সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে 'Intentionality'-র সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যন্ত্রের সাথে মানুষের তত্ত্বগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যন্ত্রের প্রভুত্ব কি মানুষের মানুষ্যত্বকে পরাজিত করেছে— এই প্রশ্ন তুলে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ হয়েছে।

বীজশব্দ: Techne, Praxis, অভিপ্রায়, স্বতঃমূল্য, যন্ত্র।

প্রযুক্তিবিদ্যার দর্শন (Philosophy of technology) বিষয়ে আলোচনা খুব বেশি পুরোনো নয়। সম্ভবত একশ বছর হয়েছে। দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের একে অন্যের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, সে বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে। কিন্তু সেই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে সংক্ষিপ্তভাবে দর্শন বলতে কী বুঝি, বিজ্ঞান বলতে কী বুঝি, এবং প্রযুক্তি বলতে কী বুঝি তার আলোচনা করা প্রয়োজন।

দর্শনশাস্ত্র নানাদেশে শত শত বছর ধরে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্চিত হওয়া সত্ত্বেও আজও 'দর্শন বলতে কী বুঝি? প্রশ্নটির সমান গুরুত্ব রয়েছে। বিখ্যাত দার্শনিকরা সারাজীবন দর্শন চর্চা করেও 'দর্শন বলতে কী বুঝি?' এই প্রশ্ন তুলেছেন এবং এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে স্পষ্ট নন। 'দর্শন' ও 'philosophy' শব্দদুটিকে সমার্থক ভাবে গ্রহণ করে 'দর্শন বলতে কী বুঝি?'—এই প্রশ্নের কতগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

কারও মতে দর্শন চর্চা করলে আমাদের জীবন ও জগত সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা, তার রূপান্তর ঘটবে। তাই দর্শনকে বলা হয় জীবনমুখী দর্শন। কাজেই দর্শন বলতে বোঝাই সেই বিষয়, যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হলে, আমাদের সামগ্রিক যে অস্তিত্ব বা আমাদের সামগ্রিক যে সত্তা তার রূপান্তর ঘটবে। অর্থাৎ একটা ভূমি থেকে আর একটা ভূমিতে উত্তরণ ঘটবে। সুতরাং দর্শন হল তা-ই যা চর্চা করলে পরে আমাদের সত্তার পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে দর্শনকে ভাবা যায়।[১]

আবার কারও মতে দর্শন চর্চা বা দর্শন জানা একাকীর কাজ নয়। অর্থাৎ আমি যখন দর্শন চর্চা করছি, তখন আমি একটি ঘরে একা একা দর্শন নিয়ে ভাবছি, আমার মনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে-এমনটা নয়। দর্শন নিয়ে আলোচনাটি হল একটি সম্মিলিত আলোচনা। কাজেই আমি যখন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, তখন আমি কারো সাথে আলোচনা করছি। এবং আর এক জন যিনি আলোচনা করছেন, তিনি আমার সাথে আলোচনা করছেন। এই সম্মিলিত যে প্রচেষ্টা থাকে, তাকে প্রাচীন সংস্কৃতে 'সংবাদ' বলে, যেখানে আমি, আপনি, সে, তারা সবাই আছে। এই সংবাদ বা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন চিন্তা, বিভিন্ন ধারণা এবং বিভিন্ন বিশ্বাস গড়ে ওঠে। যদি এই সম্মিলিত সংবাদের

মাধ্যমে আমাদের চিন্তা-ভাবনা গড়ে ওঠার কথা বলি, তাহলে এই সম্মিলিত সংবাদকে নিয়ত বা নিরন্তর বলতে পারি। এমনটা নয় যে আলোচনা খানিকটা হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই বলতে পারি যে সম্মিলিত সংবাদের মাধ্যমে আমাদের চিন্তা, ভাবনা, বিশ্বাস, বাসনা গড়ে উঠেছে, আবার কখনও ভাঙছে- এই ভাঙ্গা-গড়ার কাজটা অন্তহীন, যার কোন শেষ নেই। আমরা বলতে পারব না যে আমরা দর্শনের শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি; আর দর্শন আলোচনা করার দরকার নেই; আমাদের যা জানার কথা আমরা জেনে গেছি। এই সংবাদের বা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার ধারণা, বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, এটাকে দর্শনের শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি; আর দর্শন আলোচনা করার দরকার নেই; আমাদের যা জানার কথা আমরা জেনে গেছি। এই সংবাদের বা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার ধারণা, বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, এটাকে দর্শনের একপ্রকার আদর্শ বা model বলতে পারি। সক্রেটিসও এমনটা বলেছেন যে— "আমি ঘরে একা একা বসে জ্ঞান লাভ করতে পারব না। জ্ঞান লাভ করতে গেলে ঘর থেকে বেরিয়ে নানা জনের সাথে আলোচনা প্রয়োজন।"[৩] এই ভাবে নিয়ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান গড়ে উঠছে; শুধু তাই নয়, কিছু জ্ঞান ভেঙেও যাচ্ছে।

পরবর্তীতে কেউ কেউ দর্শনকে অন্যভাবে দেখেছেন। তাঁদের মতে দর্শন হল বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপ। বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপ বলতে বোঝানো হয়েছে যে বিজ্ঞানের কাজ যদি হয় জগত সম্পর্কে একটা সুবিন্যস্ত (systematic) জ্ঞান দেওয়া, তাহলে তার নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি আছে দর্শন সেই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে— সেই পদ্ধতিগুলো কী এবং সেই পদ্ধতিগুলোর যাথার্থ্যই বা কী? এছাড়াও বিজ্ঞান যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে, সেই প্রয়োগের জন্য কিছু ধারণা (concept)-র সাহায্য দরকার। দর্শনের কাজ হল সেই পদ্ধতিগুলো এবং তাদের প্রয়োগ করার জন্য যে যে ধারণার প্রয়োজন, তাদের ব্যাখ্যা দেওয়া। এই অর্থে, অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন যে দর্শন হল বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ।[৪]

আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, বিজ্ঞানের ভিত্তির কোন প্রয়োজন নেই, আর বিজ্ঞানের ভিত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের মতে দর্শন ও বিজ্ঞান দুটি একই সাথে সমান্তরালভাবে চলে। বিজ্ঞানের কথা যখন আমরা বলি, তখন মূলত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (scientific theory) কথা বলি। যাঁরা বিজ্ঞান ও দর্শনকে সমান্তরাল বলে মনে করেন, তাঁরা বিজ্ঞান বলতে মূলত পদার্থবিদ্যা (physical science)-কে বুঝিয়েছেন। তাঁদের কথা হল, পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্বের যে কাঠামো থাকে, সেই কাঠামোকে বিশ্লেষণ করাটাই হচ্ছে দর্শনের কাজ। এই দিক থেকে দেখতে গেলে দর্শন হল বিজ্ঞানের অংশ যা পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করে।[৫] কাঠামোর পরিবর্তন হলে তত্ত্বের পরিবর্তন হবে, আবার তত্ত্বের পরিবর্তন হলে কাঠামোরও পরিবর্তন হতে বাধ্য। কাজেই দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের বা দর্শনের সাথে প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে কী সম্পর্ক আছে তা নির্ভর করছে দর্শন বলতে আমরা কী বুঝি-তার উপর। যাঁরা বলছেন দর্শনের কাজ হল আমাদের সত্তার রূপান্তর করা, তাঁরা দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ককে একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যাঁরা মনে করেন দর্শনের কাজ হল বিজ্ঞানের ভিত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া, তাঁরাও এদের সম্পর্ককে একভাবে ব্যাখ্যা করছেন। আবার যিনি দর্শন ও বিজ্ঞানকে সামান্তরাল বলে মনে করেন, দর্শন ও বিজ্ঞান হাত ধরা-ধরি করে একসাথে চলে, তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ককে অন্যভাবে দেখেছেন। দর্শনের এই তিনটি আদল বা model-এর উপরভিত্তি করে দেখা যাক যে দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে কী সম্পর্ক আছে। কিন্তু তার আগে প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে কী বুঝি সেটা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। খুব সাধারণভাবে দেখলে প্রযুক্তিবিদ্যার যে অসাধারণ সাফল্য, তা খুব বেশি দিনের নয়; আজ থেকে একশ বছর আগে প্রযুক্তিবিদ্যা এত উন্নত ছিল না। সেদিক থেকে দেখলে দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস অনেক পুরানো। এই কারণে আমরা দর্শন ও বিজ্ঞানের স্বরূপও তাদের সম্পর্ক নিয়ে অনেকদিন ধরে

চর্চা করে চলেছি। কিন্তু দর্শনের সাথে প্রযুক্তিবিদ্যার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা এতটা পুরোনো নয়; খুবই সাম্প্রতিক কালে 'philosophy of technology' এই শব্দটা চালু হয়েছে, ১৮৭৭ সালে। যিনি এই শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেছেন তিনি কোন দার্শনিক ছিলেন না বা প্রযুক্তিবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক; তাঁর নাম হল Emst Kapp।[৬]

'Technology' শব্দটির উৎপত্তি হয় গ্রীক শব্দ 'Techne' শব্দ থেকে। অনেক সময় 'Techne' শব্দটিকে ইংরেজিতে 'Skill' অর্থে অর্থাৎ কিছু করা অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্লেটোর সংবাদ-এ Techne-এর কথা বলা হয়েছে। সক্রেটিস এই Techne-এর উদাহরণ দিয়েছেন। একজন জুতো প্রস্তুত কারক এবং একজন জাহাজ প্রস্তুত কারক, এদের প্রত্যেকের এক একটা Techne আছে। যেমন আমার জুতো ছিঁড়ে গেলে, তা ঠিক করার কৌশলটা আমার জানা না থাকায়, যে জুতো ঠিক করার কৌশল জানে তার কাছে যাই। সক্রেটিস তাই বলেছেন— এই Techne-এর একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। যেমন জাহাজ তৈরি করার উদ্দেশ্য হল— এটি দীর্ঘস্থায়ী হবে, মরচে পড়বে না, ডুবে যাবে না ইত্যাদি। এইরকম একটা ভাল জাহাজ তৈরি করাটাই হল জাহাজ প্রস্তুত করা নামক Techne-র উদ্দেশ্য।

Techne-র এই ধারণা পরবর্তীকালে Aristotle তাঁর Nichomachean Ethics-এ, যেখানে নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে নিয়ে এসেছেন এবং বলেছেন, যে কোন ক্রিয়ার একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে। Techne-র লক্ষ্য দুই রকম হতে পারে। প্রথমত, Techne-র লক্ষ্য কাজের বাইরে হতে পারে। অর্থাৎ জাহাজ তৈরী করা যদি Techne হয়, তার লক্ষ্য যদি হয় একটা ভাল জাহাজ তৈরী করা-এই লক্ষ্যটা কাজের বাইরে-কাজের মাধ্যমে এই ফলটা তৈরী করছি। দ্বিতীয়তঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্যটা বা উদ্দেশ্যটা কিন্তু যে কাজটা করছি সেই কাজের ভিতরে, কাজটির অঙ্গ। তাই Aristotle বলেছেন— আমি যে কাজটা করছি তার লক্ষ্যটা ঐ কাজের মধ্যেই নিহিত আছে। Aristotle-এর উদাহরণ হল virtue, virtuous-act হল একপ্রকার Techne। কিন্তু এই Techne-এর লক্ষ্য virtuous-act বা being virtuous এর মধ্যেই নিহিত আছে। virtuous-act-এর সাথে জাহাজ তৈরী করার পার্থক্য হল— জাহাজ তৈরীর লক্ষ্যটা কাজের অতিরিক্ত বা কাজের বাইরে। অথচ virtuous-act-এর লক্ষ্য হল veing virtuous-এর মধ্যে। এই Techne সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্লেটোর সংবাদে একটা শব্দ আছে সেটি হল 'Theoria'; আজকের ভাষায় যাকে বলা হয় Theory। এর আরও একটি ধারণা পাওয়া যায় সেটি হল Praxis, যাকে বর্তমানে Practice বলে। Aristotle-এর মতে Praxis এবং Theoria-মধ্যে পার্থক্য আছে। যখন Theoria-র কথা বলা হয়, তখন একটা uselessness এর ধারণা আসে। অর্থাৎ এখানে ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু Praxis এর ধারনাটা একেবারে উল্টো। Praxis এর মধ্যে একটা usefulness বা উপযোগিতার ব্যাপার আছে।

ভারতীয় দর্শনে, বিশেষ করে মীমাংসা দর্শনে, ঠিক এমন ভাবেই জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। কর্ম বলতে ধর্মকে বোঝায়। ধর্ম হল ভোগ্য। ভোগ্য মানে যেটা এখন নেই, কিন্তু উৎপন্ন হতে পারে। বেদবিহিত কর্ম করার মাধ্যমে ধর্ম উৎপন্ন হয়। তাহলে কর্ম কোনোকিছু উৎপন্ন করে, যা এখন নেই; কর্মের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানটা ভোগ্য নয়, জ্ঞান আমাদের কাছে আছে, নতুন করে উৎপন্ন হয় না। কাজেই যে প্রযুক্তিবিদ্যার কথা বলা হচ্ছে তা নানা ভাবে প্রাচীন গ্রীক দর্শন এবং ভারতীয় দর্শনে আলোচনা করা হয়েছে।[৭]

অনেক সময় বলা হয় দর্শনের কাজ হল তত্ত্ববোধ বা জ্ঞান লাভ করা। তত্ত্বের জ্ঞান মানে স্বরূপের জ্ঞান, জগতের

স্বরূপের জ্ঞান এই বৈচিত্র্যময় জগতে যে নানা জিনিস আছে, সেই প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে অপরের কী সম্পর্ক আছে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হল দর্শনের কাজ। এই দিক থেকে প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে দর্শনের একটা সম্পর্ক আছে। প্রযুক্তিবিদ্যা তার নিত্য নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের জীবন, ব্যবহার, আচার-আচরণ, চিন্তা সব এক সাথে বেঁধে রেখেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার ফল ঘড়ির Alarm শুনে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে আবার ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সারা দিন প্রযুক্তিবিদ্যার কোন না কোন ফল আমাদের জীবনকে যেন ছন্দময় করে তুলেছে। তাহলে দর্শনের কাজ যদি জগতের সবকিছুর একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, এবং প্রযুক্তিবিদ্যা যদি সেই দিকে যায়, তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি যে দর্শনের সাথে প্রযুক্তিবিদ্যার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু যদি আমরা প্রযুক্তিবিদ্যার দর্শনের কথা বলি, তাহলে আমরা দেখব যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোচনাটা এগিয়ে যায়— সেটা হল, মানুষের সামাজিক যে পরিস্থিতি ও নৈতিক যে দৃষ্টিভঙ্গি এই দুটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার কী প্রভাব পড়েছে।

পরবর্তী কালে কোন কোন দার্শনিক প্রযুক্তিবিদ্যার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষ্যসৃষ্ট। এই মনুষ্যসৃষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে স্রষ্টা মানুষের সম্পর্ক কেমন, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকে প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা যে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, তাদের মানুষের মত একটা মানসিক অভিপ্রায় (A) আছে কি না, যন্ত্রগুলির মধ্যে চেতনের মত কাজ করার ক্ষমতা আছে কি না— এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কাজেই প্রযুক্তিবিদ্যার দর্শন সম্পর্কে আলোচনা দুটি দিকে এগিয়েছে। প্রথমত, মানুষের সামাজিক ও নৈতিক জীবনে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে যে যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে মানবোচিত কোন গুণ আছে কি বা, থাকলে তার পারণতি কী হবে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা।[৮]

একথা ঠিক যে প্রযুক্তিবিদ্যা আজকের নয়; প্রাচীনকাল থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা ছিল। তখন তার স্বরূপ ছিল প্রকৃতির অনুকরণ করা। যেমন, পাখির বিশেষত বাবুই পাখির বাসা বাঁধার মধ্যে একটা প্রযুক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে মানুষও ঐ পাখির বাসা বাঁধার অনুকরণ করে ঘর বাঁধতে শিখেছে। তাহলে প্রাচীনকালে প্রযুক্তিবিদ্যার ধারণা ছিল প্রকৃতিকে অনুকরণ করা। এখানে কেউ কেউ প্রকৃতির সাথে মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্রের পার্থক্যের কথা বলেন। যেমন পাহাড় মনুষ্যসৃষ্ট নয়, কিন্তু মানুষ সেই পাহাড় কেটে মূর্তি তৈরি করে। কাজেই মূর্তিটি হল মনুষ্যসৃষ্ট। এবং এই মূর্তি তৈরী করার জন্য মানুষকে অনেক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ করতে হয়েছে। তাই পাহাড় যা প্রকৃতসৃষ্ট এবং মূর্তি যা মনুষ্যসৃষ্ট, এই দুটির মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রাকৃত জিনিসগুলোর মধ্যে একটা গতিময়তা আছে, প্রজনন ক্ষমতা আছে, ভিতর থেকে তাদের পরিবর্তন হয়। আর মানুষ যখন কোনো কিছু তৈরী করে তাদের মধ্যে হয়ত পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে পারে না, কিন্তু মানুষ তার মধ্যে সেই ক্ষমতাকে বসিয়ে দিয়েছে। যেমন কিছু কিছু software আছে যা autocorrecting, auto generating, সেখানে মানুষের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু software-এর এই ক্ষমতাগুলি মানুষ বসিয়েছে। তাই কেউ কেউ বলে, এই জগতটাও মানুষের সৃষ্টি। সৃষ্টি থাকলে নিশ্চয়ই স্রষ্টা থাকবে। কাজেই উপরে যে পার্থক্য করা হয়েছে, সেই পার্থক্য আর থাকে না কারণ সবই সৃষ্ট, মূর্তিটা যেমন সৃষ্ট, পাহাড়টাও তেমনি সৃষ্ট। তাহলে তাদের একটা স্রষ্টা আছে স্বীকার করতে হবে। ঋগ্‌বেদে এই সৃষ্টিকে কাব্য বলা হয়েছে, আর এই সৃষ্ট কাব্যের স্রষ্টা হলেন দেবতা। Aristotle ঠিক এমন কথা বলেছেন— This is the wonderful creation, think about the creator, who has the ability to create this beautiful picture।

একজন তাঁতি যেমন নানা রঙের সুতো দিয়ে সুন্দর সুন্দর বস্ত্র তৈরী করে, ঠিক তেমনি কোন একজন তাঁতি এই জগতকে এত সুন্দর করে বর্ণময় করে তুলেছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যযুগে Alchemy নামে এক নতুন শাস্ত্র তৈরী হয়েছিল। এই Alchemy হল— বর্তমানে যাকে রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) বলা হয়— তার আদিরূপ। মনে করা হত এই Alchemy-র সূত্র প্রয়োগ করে আমরা সোনা তৈরী করতে পারি। এই Alchemy-র উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র প্রকৃতি কেন কল করা নয়— বাবুই পাখির বাসা বাঁধা দেখে নিজেরা বাসা বাঁধার চিন্তা করা নয়; প্রকৃতিতে যা নেই, আমরা তাও তৈরী করতে পারি। এমনকি প্রকৃতি থেকে ভালো তৈরী করতে পারি। এর ফলে মনুষ্যসৃষ্ট জিনিস নিয়ে বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি হল। এইজন্য ১৪০০/১৫০০ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্পীরা মূর্তি তৈরী করেছেন।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রকৃতি যা দিয়েছে তার থেকেও ভাল মানুষ তৈরী করতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দার্শনিকদের প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে চিন্তাটা একটু অন্য মোড়কে দেখা যায়। এবং তার জন্য কিছু সামাজিক কারণ আছে। তাঁরা যেদিক থেকে প্রযুক্তিবিদ্যার আলোচনা করেছেন তাকে বলা হয় Humanistic Philosophy of Technology। এই দর্শনে 'মানুষ' চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। Heidegger-এর দর্শন চর্চার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ।

বিজ্ঞানের যে দর্শন, সেখানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের জন্য যে ধারণা প্রয়োজন সেই নিয়ে আলোচনা করে। দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের এইরূপ সম্পর্ক কিন্তু দর্শন ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে নয়। একটা বিষয়ে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই যে প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে যে নব নব বস্তু উৎপন্ন হয়েছে, তাতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আছে। অর্থাৎ বলতে পারি, বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু বিংশশতাব্দীতে প্রযুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করছে। এখন প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের বলে দেয় কিভাবে আমরা বিজ্ঞানকে আলোচনা করব। প্রযুক্তির প্রয়োজনেই বিজ্ঞান তার গবেষণা চালায়। প্রযুক্তি বলে দেয়, বিজ্ঞান তার আলোচনা কোন কোন দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক চিন্তা নির্ধারিত হয় প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা।

প্রযুক্তিবিদ্যার ফল স্বরূপ যন্ত্রগুলি সবসময় একটা উপায় প্রয়োগ করে কিছু করতে চায়- এটাই প্রযুক্তিবিদ্যার স্বভাব। সে নিজেকে প্রয়োগ করে কিছু আদায় করতে চায়। এখন market economy যে দিকে এগোবে, সেদিকে প্রযুক্তিবিদ্যাও যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান ও market economy-র মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। ঠিক এই কারণে, যে বিষয়ে গবেষণা করলে এই জগতে মানুষের অনেক উপকার হত, সেই বিষয়ে market economy-র দৃষ্টি না থাকায় সেই বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে না, ফলে প্রযুক্তিরও সেই বিষয়ে উন্নতি হচ্ছে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রযুক্তিবিদ্যা সবসময় যান্ত্রিকতা ও পরতঃমূল্যের প্রকাশ করে, সে সব সময় মনে করে যে সে একটা কিছু করবে, কেননা এটা করলে তার কিছু একটা আদায় হবে, লাভ হবে। এই ধারণা প্রযুক্তিবিদ্যায় আসার ফলে মানুষের মধ্যে স্বতঃমূল্যের (intrinsic value) ধারণা চলে গেছে। ফলে আমরা বন্ধু বলতে তাকেই বুঝি যে আমার উপকারে আসবে, যার দ্বারা কিছু আদায় হবে। এটাই প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে। সব থেকে ক্ষতি হয়েছে যে আমরা প্রকৃতিকেও প্রযুক্তির দৃষ্টিতে দেখছি; কিভাবে নদীর জলকে আটকালে আমার সুবিধা হবে, কিভাবে পাহাড় কাটলে আমার অর্থাৎ এক বিশেষ মানবগোষ্ঠির সুবিধা হবে, অন্য মানব গোষ্ঠির সুবিধা হল কি হল না সেটা না ভেবে আমরা নদীতে বাঁধ দিই বা পাহাড় কাটি। প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের এই স্বার্থপরতা শিখিয়েছে।

প্রযুক্তিবিদ্যার ফল যে সর্বদাই সুখকর হয়েছে তেমন নয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিদ্যার

একটি ভয়ঙ্কর রূপের কথা বলেছেন।[৯] মুক্তধারা একটি জল ধারার নাম যেটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব প্রদেশের মানুষ সেই জলধারা আটকেছে। সেখানে এক পাহাড়ের চূড়ায় একটি লৌহ যন্ত্র আছে এবং তার অপরদিকে একটা মন্দির আছে। পাহাড়ের সেই মন্দিরে উৎসব হচ্ছে। কারণ মুক্তধারার জলকে সেই যন্ত্রের দ্বারা বেঁধে ফেলা হয়েছে। ফলে উত্তর-পূর্ব প্রদেশের মানুষদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। যন্ত্ররাজ বিভূতি একজন মহান ব্যক্তি, সকলে তাঁর প্রশংসা করছে। বহু বছরের চেষ্টার পর তিনি মুক্তধারার জলকে বেঁধে দিয়েছেন। এই আনন্দের উৎসবের সময় একজন মা তার ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছে না, তাকে ডেকে বেড়াচ্ছে। ছেলেকে ডাকতে শুনে একজন সেই মাকে, 'সুমনকে ডাকছে কেন' জিজ্ঞাসা করায়, মা বলেন যে মুক্তধারার বাঁধ তৈরী করার সময় তার ছেলে সুমনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারা বাঁধ তৈরী করতে সমুনের মত উত্তর-পূর্ব প্রদেশের সমস্ত ছেলেদের যেতে বাধ্য করেছিল এবং তারা সবাই এই বাঁধ তৈরী করতে গিয়ে মারা গেছে। তাই বিভূতি সেই মাকে বলছে, 'তোমার ছেলে মারা গেছে তো কী হয়েছে! যন্ত্র তো হয়েছে, মুক্তধারার জলধারাকে বাঁধা তো গেছে'। মানুষের থেকে যন্ত্র বেশী মূল্যবান হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে— মানুষের জন্য যন্ত্র, নাকি যন্ত্রের জন্য মানুষ।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. এই দুটির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন গোপীনাথ ভট্টাচার্য তাঁর *Essays in Analytical Philosophy* (কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৯) গ্রন্থে।

২. এই কারণেই ভারতীয় দর্শনে মুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে। যোগেন্দ্রনাথ বাগচী-র *ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়* (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ১৯৫৮) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

৩. Plato, 'Phaedrus' *Complete Dialogues of Plato,*(eds), E. Hamilton and H. Caims, Princeton University Press, 1961, p. 479.

৪. অনেকে মনে করেন যে কান্ট নিউটনীয় বিজ্ঞানের এক দার্শনিক ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

৫. এই প্রসঙ্গে কোয়াইনের '*Epistemology Naturalized*' (প্রবন্ধটি আছে *Ontological Relationity & other essays* Columbia University Press, New York, 1968) দ্রষ্টব্য।

৬. Frensen Maorten, Lokhorst Gert-Jan, Van de- Poel Ibo, 'Philosophy of Technology', *Stanford Encyclopedia of Philosophy,*fall 2008, Edward M. Zalta (ed.) Url=https:.//plato.standford.edu/ archives/Fall 2018/entries/technology

৭. এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন জিতেন্দ্রনাথ মোহান্তি। তাঁর Theory and Practice (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ১৯৯৪) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

৮. পরবর্তী আলোচনার জন্য আমি গভীরভাবে ঋণী Frensen Maorten, Lokhorst Gert- Jan, Van de- Poel Ibo, 'Philosophy of Technology', *Standford Encyclopedia of Philosophy,* fall 2008, Edward M. Zalta (ed.) Url=https://plato.standford.edu/archives/Fall 2018/entries/technology.

৯. রবীন্দ্রনাথ, 'মুক্তধারা', রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, শিক্ষাসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী সরস্বতী প্রেস, কোলকাতা, পৃ. ৮৩৫